পুণ্য উপাসনায় যে বিষয়াদি সংস্কৃত্যায়ন করা যেতে পারে ঃ

ক) স্থানীয় ভাষার প্রচলন ঃ সৃষ্টির গোড়া থেকেই যে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার উপাসনা পূজা-অর্চনা নিজ নিজ ভাষায় করে আসছে তা অস্বীকার করা যায় না। তাই আমরা দেখতে পাই ইহুদীরা হিব্রু ভাষায়, গ্রীকরা গ্রীক ভাষায়, রোমীয়রা রোমীয় বা ল্যাটিন ভাষায়, আরবীয়রা আরবীয় ভাষায়, মিশরীয়রা মিশরীয় ভাষায়, ভারতীয়রা ভারতীয় ভাষায়, আর বাঙালীরা বাংলা ভাষায় বিধাতার উপাসনা করে আসছে। উপাসনার এই ভাষাগুলি আপন আপন দেশে প্রচলিত ও বোধগম্য ছিল। সুতরাং মানুষ তার প্রাণের দেবতাকে প্রাণ ভরে পূজারতি করতে পারত নিজ নিজ ভাষায়। উপাসনা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের স্বকৃতজ্ঞ স্তুতি গান যা স্বতস্ফূর্ত ভাবে মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত হবার কথা। ঠিক এই জিনিষটি আমাদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা যার কল্যাণে আমরা আজ বিভিন্ন ভাষায় উপাসনা করার সুযোগ পাচ্ছি।

খ) স্থানীয় চিহ্নাবলীর প্রচলন ঃ চিহ্ন যদিও উপসনার কেন্দ্রীয় বস্তু নয় তথাপি চিহ্ন ব্যতীত উপাসনা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি উপাসনায় ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ চিহ্নের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আত্মায় আত্মায় যোগাযোগের জন্য চিহ্নের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু মানুষ যেহেতু দৈহিক আত্মা সে জন্য প্রতিটি যোগাযোগের জন্য তার চিহ্নের প্রয়োজন। চিহ্নের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের প্রতি পূজা নিবেদন করতে পারি। উপাসনার মধ্যে যে সমস্ত চিহ্নাবলী ব্যবহৃত হয় তা চার ভাগে ভাগ করা যায়:

ক) ব্যক্তি ঃ মানুষ নিজেই ঐশ উপস্থিতির এবং পরিত্রাণ কাজের চিহ্ন হতে পারে। এভাবে উপাসনার জন্য সমবেত ভক্ত মণ্ডলীই উপাসনার জন্য একটি চিহ্ন। তদ্রুপ, উপাসনাকারী যাজক, পাঠক, সেবক প্রত্যেকেই উপাসনা কার্যের চিহ্ন।

খ) কথা/বাক্যঃ উপাসনায় ঈশ্বরের প্রতি মানুষ তার মনের ভাব ব্যক্ত করে। মুখের কথা দিয়ে সে তার ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদি ঈশ্বরকে জানায়। তাই সে প্রার্থনা করে, গান করে, উপদেশ দেয়। এ সবই তার মনের ভাব প্রকাশেরই চিহ্ন।

১। প্রার্থনা ঃ প্রার্থনায় আমাদের ব্যক্তিগত ও একক ধারাগুলো ঈশ্বর ও অনেক মানুষের হৃদয় একত্রিত হয়ে উঠে তা সার্বজনীন ও সম্মিলিত ধারা হয়ে উঠতে থাকে। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। আর এই অনুষ্ঠান আমরা দেশীয় কৃষ্টিতে করতে পারি যা হবে অর্থপূর্ণ।

২। নাচ/নৃত্য ঃ খ্রীষ্টীয় চিত্রকলা, খ্রীষ্টীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের দারিদ্র্য সর্বজন সমক্ষে প্রকটভাবে প্রতীয়মান। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা এ বিষয়ের গুরুত্ব পোষণ করে বলেন যে, শিল্পীদের প্রতি বিশপদের বিশেষ মনোনিবেশ থাকা উচিত যাতে পুণ্য উপাসনা বিষয়ে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা যায় (উপাসনা বিষয়ক সংবিধান ১২৭ নং)। নৃত্যর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের পূজা-অর্চনা করে থাকি। ভক্তি নৃত্যর মধ্য দিয়ে আমরা ব্যক্তিকে ঈশ্বরের দিকে তার মনকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করি এবং সৃষ্টিকর্তাকে একান্ত ভাবেই পূজা করি। আর সেই নৃত্য যদি হয় দেশীয় তা হবে উপাসনার মধ্যে অর্থপপূর্ণ।

৩। গান ঃ খ্রীষ্টীয় উপাসনায় সঙ্গীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঙ্গীতের ছোয়ায় উপাসনা প্রাণবন্ত ও অধিকতর ফলপ্রসু হয়ে উঠে। মনের কথাটি কথা দিয়ে যতখানি প্রকাশ করা যায় না তার চেয়ে বেশী ও গভীর ভাবে প্রকাশ করা যায় গানের মাধ্যমে। তবে অবশ্যই সেই গান হওয়া চাই নিজস্ব গান অর্থাৎ আপন কৃষ্টিগত সুর ও বাদ্যযন্ত্রে অনংকৃত গান। তাই এ দেশীয় গানের জন্য চাই এ দেশীয় সুর এবং দেশীয় বাদ্যযন্ত্র। প্রকৃত পক্ষে গত ভাটিকান মহাসভায় বিভিন্ন দেশের উপাসনার মধ্যে সঙ্গীত হতে হবে শাস্ত্রভিত্তিক রচনা এবং স্বরে সহজ সরল রসবোধ।

৪। পাঠ ঃ ঈশ্বরের বাণী অনাদিকাল থেকে ঘনীভূত হয়ে একমাত্র বাণী বহু মানবীয় কথায় ও কাজে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন আর সেই বাণীকে আমরা আরতি ও ফুলের মালা দেওয়ার মধ্যদিয়ে উপাসনায় প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

গ) অঙ্গভঙ্গি ঃ অঙ্গের সঞ্চালন ও সংস্থাপন দ্বারা মানুষের বিশেষ বিশেষ মনোভাব প্রকাশ পায়। অন্তরের অনুভূতি যেমন কথা দিয়ে ব্যক্ত করা যায় তেমনি শরীরের ভঙ্গি দিয়েও ব্যক্ত করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে যা কথায় বলা হচ্ছে তাই আরো স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় দেহের বা অঙ্গের ভঙ্গিতে। আশীর্বাণীর সঙ্গে হস্ত প্রসারণ কিংবা ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কন দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আশীর্বাদ পরিব্যক্ত হয়। আবার কোনো কোন ক্ষেত্রে কথার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি না থাকলে কথাটি ফলপ্রসূ হয় না। যেমন দীক্ষাস্নান সংস্কারের আসল কথা গুলোর সাথে সাথে দীক্ষাপ্রার্থীকে জলে নিমজ্জিত করে উঠতে হবে কিংবা তার মাথায় জল ঢালতে হবে। আর যে সমস্ত অঙ্গভঙ্গি আমরা উপাসনায় আমাদের দেশীয় রীতিতে করে থাকি এবং তা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে যথাঃ মাথা নত করা, জানুপাত করা, দাঁড়ানো, বসা, হাত জোর করা ইত্যাদি।

ঘ) জিনিসপত্র ঃ সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর মানুষকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং সেই অস্তিত্বকে শোভিত করেছেন ফুলে-ফলে, সৌরভে, জলে-স্থলে-বায়ুতে, সূর্যে-চন্দ্রে-নক্ষত্রে। তার এই অপরিসীম ও অযাচিত দানের প্রতিদান হয় না। তাই মানুষ বেদিতে নৈবেদ্য রাখে ধূপারতি, পুষ্পাঞ্জলিসহ অর্ঘ সাজিয়ে নিবেদন করে যজ্ঞাবলী। আর এই উপাসনা অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন জিনিষপত্র এবং যা দেশীয় হওয়া জীবন পাই।

১। জল ঃ জল হলো জীবন ও প্রাণের প্রতীক। এই জল অর্পণের মাধ্যমে আমাদের জীবন যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আর এই আশীর্বাদিত জল গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন জীবন পাই।

২। দ্রাক্ষারস ঃ দ্রাক্ষারস হলো প্রেমপূর্ণ জীবন এবং আত্মদানের প্রতীক। বহু দ্রাক্ষাফল থেকে সৃষ্ট ও নিঃসৃত এই দ্রাক্ষারস প্রভুর বেদীতে অর্পণ করি। খ্রীষ্টের রক্তে রূপান্তরিত এই দ্রাক্ষারসের মাধ্যমে আমরা যেন ভালবাসা, আত্মত্যাগ ও একতায় বৃদ্ধি লাভ করি।

৩। রুটি ঃ রুটি মানুষের শ্রমের ফল। রুটি মানুষের জীবন রক্ষা করে এবং পুষ্টি সাধন করে। সুস্থ সরল জীবনের প্রতীক এই রুটি আমরা বেদীতে অর্পণ করি যাতে এই রুটি খ্রীষ্টদেহে পরিণত হয়ে আমাদের জীবনদায়ী খাদ্য হয়ে ওঠে।

৪। কাসার বাটি/ থালা ঃ আমাদের দেশীয় কৃষ্টিতে কাসার বাটি বা থালার প্রচলন রয়েছে তাই পুণ্য উপাসনায় আমরা কাসার থালা বা বাটি পানপাত্র ও থালা হিসাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে সেটা হবে আমাদের জন্য খুবই অর্থপূর্ণ।

৫। ফুল ঃ ফুল হচ্ছে ভালবাসা, আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। এই ফুল অর্পণের মাধ্যমে আমাদের জীবন যেন খ্রীষ্টীয় প্রেমে বলিয়ান হয়ে ওঠে।

৬। ফল ও সবৃজি ঃ ফল ও সবৃজি জমি থেকে উৎপাদিত আমাদের কঠোর শ্রমের ফসল ও ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ দান। এগুলো আহার ক'রে আমরা যে বল ও শক্তি পাই, তা যেন ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করতে পারি।

৭। ধূপারতি ঃ খ্রীষ্ট ধর্ম মতে পবিত্র বাইবেলে আরতির প্রচলনের সন্ধান পাওয়া যায় আদি ৪:১-১৬, ঈশ্বরের নিমিত্তে কাইন ও আবেরের অর্ঘ্য উৎসর্গের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে আরতি ও ধুপারতির মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। মঙ্গলবার্তায় লুক ৩:৮-১১ পদে জেরুশালেম মন্দিরে ধর্মযাজকের যজ্ঞ ও প্রার্থনার সময় যে আরতি দেওয়ার প্রচলন ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া পবিত্র বাইবেলের আরো বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন অধ্যায়ে আরতির প্রচলনের সন্ধান পাওয়া যায়।